সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কাজী আব্দুল ওদুদের জীবনদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ

সাঁইত্রিশ বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা ।। আষাঢ় ১৪০১

Vol. 37 | No. 3 | 1994

Check for updates

Volume	37
Issue	3
Year	1994
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মিহির মুসাকী
Published online	June 1, 1994
DOI	10.62328/sp.v37i3.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i3.10
Pages	183-192
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ৩

Check for updates

কাজী আবদুল ওদুদের জীবনদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ

মিহির মুসাকী

বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে মুক্তচিন্তার অন্যতম পুরোধা কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)। বিশ শতকের প্রথমার্ধে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ও *শিখার* অন্যতম স্থপতি তিনি।

প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যে কাজী আবদুল ওদুদের এক অসামান্য অবদান দু'খণ্ডে সমাপ্ত *কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬২, ১৯৬৯)। রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতি ওদুদের ছিল পরম বিস্ময় ও গভীর শ্রদ্ধা। বিনীত ভঙ্গিতে মুগ্ধচিত্তে রবীন্দ্রসৃষ্টির বিশালতাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ কবির জীবনচেতনা। মূল্যায়নে পূর্ববর্তীদের দ্বারা পরিচালিত বা বিভ্রান্ত নন তিনি। এক্ষেত্রে ওদুদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা প্রশংসনীয়।

মুসলমান-সমাজের পশ্চাদপদ সময়ে কাজী আবদুল ওদুদ-রবীন্দ্র-প্রতিভার যে মূল্যায়ন করেছেন, তা আজও প্রাসঙ্গিক।।

অনুবাদক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

ব্যক্তির সজ্ঞান অনুশীলন, সমাজ-অনুধ্যান, জীবনদর্শন যখন তত্ত্বমুখ্য না হয়ে জীবনাবেগে যুক্ত হয়, তখনি তা লাভ করে শিল্পশুদ্ধ সমগ্রতা। বাঙালি মুসলমান সমাজে কাজী আবদুল ওদুদের (১৮৯৪-১৯৭০) ভাবুকতা একাধারে মুক্তবুদ্ধি-পরিস্রুত দার্শনিকতা এবং সৃজনশীলতার সমীকরণে সমৃদ্ধ। তাঁর শিল্পনীতি যেমন জীবননীতি-শাসিত, তেমনি জীবননীতিও শিল্পরীতি বিবিক্ত নয়। একারণে কাজী আবদুল ওদুদের সমগ্র সাহিত্য-সাধনা তাঁরই জীবনদৃষ্টির সমগ্রতা বোধে শীলিত, পরীক্ষিত এবং উত্তীর্ণ। উনিশ শতকীয় সাহিত্য ও শিল্পদৃষ্টির মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা ও সমগ্রতাবোধ কাজী আবদুল ওদুদের সৃজনশীলতার কেন্দ্রীয় বিন্দু। তিনি জীবন এবং শিল্পকে একটি সমগ্র দৃষ্টিকোণে আবিষ্কার ও উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ' মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬) এবং *শিখা* (১৯২৭)- পত্রিকা-কেন্দ্রিক 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের মূলমন্ত্র কাজী আবদুল ওদুদের সমগ্র সাহিত্য-সাধনার অন্যতম প্রেরণা-উৎস ছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারায় মননশীল প্রাবন্ধিক হিসেবে কাজী আবদুল ওদুদ খ্যাতিমান হলেও তাঁর সাহিত্য সাধনা শুরু হয়েছিলো কথাসাহিত্য দিয়ে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *মীর পরিবার* (১৯১৮) একটি গল্প সংকলন।

কাজী আবদুল ওদুদের প্রবন্ধে স্পষ্টত দুটি ধারা লক্ষনীয়। একদিকে রয়েছে সমাজসংস্কারমূলক রচনা; যেখানে বাঙালি মুসলমান সমাজের ধর্মান্ধতা, শিক্ষাহীনতা, অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কার থেকে মুক্তির জন্যে তিনি নানা যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেছেন। অন্যধারায় রয়েছে সাহিত্যবিষয়ক রচনা ও সাহিত্য-সমালোচনা। কাজী আবদুল ওদুদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হযরত মোহাম্মদ (দঃ), গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথের জীবন ও আদর্শ নিয়ে রচিত তিনটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করবো।

ওদুদ-জীবনীকার খোন্দকার সিরাজুল হক লিখেছেন :

> ওদুদের সাহিত্য জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অত্যধিক। ১৯১৩ সালে কলকাতায় এসেই 'গীতাঞ্জলি'র গান শুনে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন এবং 'গীতাঞ্জলি'. কিনে গান শুনতে থাকেন। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যাপনাকালে ১৯২৪ সালে ঢাকায় 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী' নামে একটি সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। এ- প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও ওদুদ যুক্ত ছিলেন। তিনি ঢাকার নর্থ ব্রুক হলে অনুষ্ঠিত 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী'র তিনটি অধিবেশনে (আষাঢ় ১৩৩১) রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক

প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯২৭ সালে এটি রবীন্দ্র কাব্যপাঠ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় [খোন্দকার সিরাজুল হক ১৯৮৭ : ২৩]।

এ-গ্রন্থ পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে তাঁর যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, তা নিম্নরূপ :

আমার রচনার এমন সরস বিচারপূর্ণ সমাদর আর কারো হাতে লাভ করেছে বলে মনে পড়েনা। এর মধ্যে যে সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ভাষানৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে তা বিস্ময়কর। তোমার মতো পাঠক পাওয়া কবির পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়।' [খোন্দকার সিরাজুল হক ১৯৮৭ : ২৪]।

কবি রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যকর্ম নিয়ে কাজী আবদুল ওদুদের বিশাল সৃষ্টি *কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ*। *কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ* (প্রথম খণ্ড)-এর অবতরনিকা অংশে কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন :

যা মহৎ ও বিরাট তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হতে হলে প্রস্তুতিরূপে চাই সীমাহীন কৌতূহল আর শ্রদ্ধা। এ ভিন্ন অন্য উপায় যে আছে তা মনে হয় না।
মহৎ বিরাট রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে আমরাও জিজ্ঞাসু হয়েছি পরম বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায়। কোনো শিথিলতা কোনো প্রচ্ছন্ন বিমুখতার দ্বারা বিঘ্নিত না হোক আমাদের পরিমিত সাধ্য [কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৬২ : ১]।

রবীন্দ্রসাহিত্য-অনুধ্যানে কাজী আবদুল ওদুদের আন্তরিকতা, পরমশ্রদ্ধা এবং ইতিবাচকতা তাঁর স্বীকারোক্তিতেই উচ্চারিত। তিনি বিনীত ভঙ্গিতে, মুগ্ধচিত্তে রবীন্দ্রসৃষ্টির বিশালতাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। একারণে রবীন্দ্রসাহিত্যের কোনো খণ্ডকর্মকে আলোচনার বিষয় করেননি। তাঁর অন্বিষ্ট ছিলো সমগ্র রবীন্দ্রনাথ। *কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তিনি 'বাল্য ও কৈশোর' শিরোনামে আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথের জীবনী। সে সময়ে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে প্রাগ্রসর ঠাকুর পরিবারের সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমি, রবীন্দ্রনাথের মানসগঠনে তাঁর পিতা ও ভ্রাতার ভূমিকা, বিহারীলাল চক্রবর্তী এবং অন্যান্য গুণীজনের সংস্পর্শের প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন জনাব ওদুদ। এ-গ্রন্থে রবীন্দ্র-সাহিত্যকর্মকে তিনি তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথমত, 'কিশোর কবি' উপশিরোনামে আলোচিত হয়েছে: বনফুল, *কবিকাহিনী*, আমেদাবাদ, বোম্বাই, বিলাত-যাত্রা, *বাল্মীকি প্রতিভা*, *ভগ্ন-হৃদয়*, *য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র*, *শৈশব সঙ্গীত*, *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী*, *সন্ধ্যাসঙ্গীত*,

প্রভাতসঙ্গীত, ছবি ও গান, কয়েকটি নিবন্ধ সংগ্রহ, *প্রকৃতির প্রতিশোধ* এবং *বউ ঠাকুরানীর হাট*। দ্বিতীয়ত, 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে' উপশিরোনামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নতুন বৌঠাকুরুনের তিরোধান, মসীযুদ্ধ, *রাজর্ষি, চিঠিপত্র, কড়ি ও কোমল, মানসী, মায়ার খেলা, রাজা ও রানী, বিসর্জন, মন্ত্রি অভিষেক, য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়রি, চিত্রাঙ্গদা, 'সাধনা'র সূচনা, সোনার তরী , ছোটগল্প, পঞ্চভূত, ছিন্ন পত্রাবলী , চিত্রা, নদী, বিদায় অভিশাপ, চৈতালি, মালিনী ও সমাজ*। তৃতীয়ত, 'এবার ফিরাও মোরে' উপশিরোনামে আলোচ্য প্রসঙ্গ: *কল্পনা, কথা ও কাহিনী, কনিকা, ক্ষণিকা ও নৈবেদ্য*।

আমরা দেখছি কাজী আবদুল ওদুদের রবীন্দ্র-বিবেচনায় তাঁর শিল্পীসত্তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর জীবনচেতনা। রবীন্দ্রসাহিত্যের দার্শনিক প্রজ্ঞা, নৈতিকচেতনা এবং বিশ্ব মানবিকতা ওদুদের আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। মুক্তবুদ্ধির সাধক কাজী আবদুল ওদুদ উনিশ শতকীয় নবজাগরণ-লব্ধ যে সাহিত্যাদর্শ, যার অন্যতম সংবেদ সমাজসংস্কার ও মানবহিত; তাকেই তাঁর সাহিত্যবিবেচনার মানদণ্ড করেছেন। একারণে রবীন্দ্রনাথের *মানসী* কাব্য আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

> মানসীতে কবির শিল্পনৈপুণ্যও নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে—বাংলার একালের কব্যের ইতিহাসে সে সবও লক্ষণীয়। কিন্তু আমাদের প্রধান বিষয় কবির মানস, কবির জীবন ও জগৎ চেতনার পরিচয়, কবির শিল্পনৈপুণ্য তার আনুষঙ্গিক- তার বেশি নয় [কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৬২ : ১১০]।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে 'মহৎ সাহিত্য' বলতে কাজী আবদুল ওদুদ শিল্পনৈপুণ্যকে প্রাধান্য দেননি। তাঁর মতে,

> ... মহৎ সাহিত্যে বিশেষভাবে দেখা যায় মহৎ জীবনচেতনা ও জগৎ-চেতনা। মহৎ সাহিত্য আমাদের শুধু প্রীত করেনা, আমাদের জীবনকে মহৎ চেতনায় নতুন করে উদ্বুদ্ধ করে [কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৬২ : ১১০]।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, ওদুদের অন্যতম প্রবণতা ছিলো রবীন্দ্র সাহিত্যের মহত্ত্ব-আবিষ্কার। যে কারণে তিনি বলেছেন,

> গ্যেটের মতো রবীন্দ্রনাথও একই সঙ্গে কবি আর মনীষী; জগতের কল্যাণও তাঁর গভীর ভাবনার বিষয়। কবির যৌবনের কাব্য 'মানসী'তেই সে সবের পরিচয় আমরা পেলাম [কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৬২ : ১১০]।

কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন একজন একনিষ্ঠ রবীন্দ্র-পাঠক। তাঁর রবীন্দ্র অনুধ্যান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে নারায়ণ চৌধুরী বলেছেন :

> ওদুদের মতো রবীন্দ্র-সাহিত্যের এমন নিবিড় অনুরাগী পাঠক খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে বলতে পারি, রবীন্দ্র ভাবধারায় তাঁর মন ছিল ওতপ্রোতভাবে নিশ্নাত। রবীন্দ্র-কাব্য থেকে বহু অংশ তিনি অনর্গল আবৃত্তি করে যেতে পারতেন এবং আলাপ আলোচনায় রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে বারেবারেই আসত। এটা তাঁর বেলায় শুধু রবীন্দ্র সাহিত্য-অনুরাগের প্রমাণ বহন করত না, রবীন্দ্র জীবনাদর্শেরও নিবিষ্ট অনুরাগের প্রমাণ বহন করত [রশীদ আল ফারুকী ১৩১৪ : ২৭]।

কাজী আবদুল ওদুদ রবীন্দ্র সাহিত্যে মহৎ জীবনচেতনা অনুসন্ধানে বৃত হয়েছেন। একারণে *রাজর্ষি* উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য:

> ··· রাজর্ষিকে উপন্যাস হিসেবে তেমন মূল্যবান জ্ঞান করা যায় না বলেই আমাদের ধারণা হয়েছে। এতে মহৎ চিন্তা আমরা অনেক পাই; কিন্তু সেইসব মহৎ চিন্তা সত্যকার রক্তমাংসের মানুষের রূপ গ্রহণ করেনি [কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৬২ : ৭৯]।

রবীন্দ্রসাহিত্য মূল্যায়ন করতে গিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ পূর্ববর্তী আলোচকদের মতামত, মন্তব্যে বিভ্রান্ত বা পূর্বসংস্কারচালিত হননি। *সোনার তরী* কাব্যগ্রন্থ আলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি বলেছেন :

> ··· একালের উপনিষদ-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ আনন্দ বলতে বুঝেছেন জীবনানন্দ, জড়ে জীবে প্রাণের আনন্দ- সেই প্রাণের আনন্দের মহিমা-গান তাঁর কাব্যে অন্তহীন হয়েছে।
>
> কবির এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কেউ কেউ বুঝেছেন একটি মতবাদ বলে। মোহিতবাবু এর নাম দিয়েছেন জগৎ ব্রহ্মবাদ। জগৎ, অর্থাৎ যা কিছু সামনে রয়েছে, দেখা যাচ্ছে, সে সব যে রবীন্দ্রনাথের চোখে এক অপরিসীম-অর্থভরা তাতে সন্দেহ নেই। তবু তাঁর এই অনুভূতিকে বা দৃষ্টিভঙ্গিকে জগৎ ব্রহ্মবাদ বলা, অর্থাৎ জগৎই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম বলতে তার অতিরিক্ত কিছু নেই কবিকে এমন ধারণার প্রচারক জ্ঞান করা, অশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে দৃশ্যত একটি অদ্ভূত ধারণার পরিচয় দেওয়া। বিচার করে দেখলেও বোঝা যাবে এ মত একদেশদর্শী ভিন্ন আর কিছু নয় [কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৬২ : ১৬৪]।

রবীন্দ্রকাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব সম্পর্কে অনেক তর্কবিতর্ক রয়েছে। রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের গীতিকবিতার কিংবা তার পূর্ববর্তী বৈষ্ণব কবিতার চেতনাগত উত্তরাধিকার বহন করলেও পাশ্চাত্যের ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরীজ, শেলীর প্রভাবও অনস্বীকার্য। কিন্তু সৃষ্টিশীল রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল প্রেরণা যে স্বদেশজাত তাও ধ্রুব সত্য। কাজী আবদুল ওদুদ রবীন্দ্র-প্রতিভা বিবেচনায় এ দিকের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। *সোনারতরীর* 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাঁর মতামত এক্ষেত্রে লক্ষণীয়:

কল্পনাদেবীর তরণী যে কবিকে নিয়ে পশ্চিমের দিকে চলেছে একথা কবিতাটিতে দুই জায়গায় বলা হয়েছে। তাতে কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন, একালের বাংলা সাহিত্যের এবং কবির নিজেরও যে য়ুরোপীয় সাহিত্য থেকে বিশেষ প্রেরণা লাভ হয়েছিল সেই কথা এখানে বলা হয়েছে। কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন, য়ুরোপীয় সাহিত্যই যে কবির বিশেষ প্রেরণার স্থল, বিশেষ শ্রদ্ধারও বস্তু, তার ইঙ্গিতও এই কবিতায় আছে কিন্তু এই শেষোক্ত ব্যাখ্যা অদ্ভুত। আমরা দেখেছি য়ুরোপীয় সাহিত্য থেকে প্রেরণা কবি অল্প বয়সেই লাভ করেছিলেন; কিন্তু কাব্য-প্রচেষ্টায় বিশেষ প্রেরণা তার লাভ হয়েছিল আমাদের দেশের কবিদের থেকেই [কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৬২ : ১৬৯]।

অবশ্যি রবীন্দ্রকাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাবকেও কাজী আবদূর ওদুদ স্বীকার করেছেন। এসব সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাস করতেন—

... বিশেষভাবে ভারতীয় ও বাঙালী–বৈষ্ণব পদাবলী, কালিদাস, আর উপনিষদের আনন্দবাদ তাঁর ভাষাছন্দ ও মানস গঠনে সবচাইতে বেশি সহায় হয়েছিল [কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৬২ : ১৭০-৭১]।

রবীন্দ্রকাব্য আলোচনায় কাজী আবদুল ওদুদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী সমালোচকদের মতামত দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য হিসেবে ওদুদের স্বীকৃতি পেয়েছে *নৈবেদ্য*। *নৈবেদ্য* কাব্য নিয়ে লেখকের উচ্ছ্বসিত বক্তব্যের একটি অংশ নিম্নরূপ :

কোনো কোনো সমঝদারকে বলতে শুনেছি, 'নৈবেদ্যে'র সাহিত্যিক গুণপনা যতই থাকুক তবু মোটের উপর তা ধর্মভাবের কাব্য, তাই তার আবেদন সীমিত হওয়াই স্বাভাবিক।

> এই বিচার যে স্থূল তা আমরা বলতে চেষ্টা করেছি। 'নৈবেদ্যে'র আবেদন সীমিত হওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু তা না হওয়াই সংগত, কেননা 'নৈবেদ্য' কাব্য হিসেবে অতি উচ্চাঙ্গের। এক ওজস্বল আত্মা অমর সৃষ্টি মহিমা লাভ করেছে এই কাব্যে। হয়ত রবীন্দ্র-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান এটি [কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৬২ : ৫৪৯]।

রবীন্দ্রকাব্য ছাড়াও তাঁর ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ আলোচনা করেছেন। *কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থে রবীন্দ্রগল্প নিয়ে একটি দীর্ঘ আলোচনা যুক্ত হয়েছে। মূলত বিবরণধর্মী এ-রচনাটি তথ্যপূর্ণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংক্ষেপে তিনি গল্পের কাহিনীগুলো বর্ণনা করেছেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখিত হয়েছে। তাহলো, রবীন্দ্রগল্পে পল্লীজীবনের আন্তরিক চিত্র কতটুকু উপস্থাপিত হয়েছে। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ বড় জমিদার, তাই পল্লীজীবনের পুরোপুরি পরিচয় তাঁর আয়ত্তের বাইরে ছিল [কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৬২ : ১৭৫]।

অধ্যাপক বিশীর এ ধারণা কাজী আবদুল ওদুদ ভ্রান্ত প্রমাণ করেছেন রবীন্দ্রনাথেরই উক্তি উদ্ধৃত করে :

> 'কুঁড়ির মধ্যে যে কীট জন্মেছে সে জানে না ফুলকে। জানে বাইরে থেকে যে পেয়েছে আনন্দ। আমার যে নিরন্তর ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে আমি পল্লী গ্রামকে দেখেছি তাতেই আমার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছে [কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৬২ : ১৭৫]।

রবীন্দ্র ছোটগল্প বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধটি সংযোজিত হয়েছে *কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ*-এর দ্বিতীয় খণ্ডে। কাজী আবদুল ওদুদ এই প্রবন্ধের শিরোনাম দিয়েছেন 'সবুজপত্রের যুগের ছোটগল্প'। পূর্ববর্তী আলোচনার চেয়ে এটি অনেক বেশি বিশ্লেষণধর্মী এবং প্রাগ্রসর। আমরা জানি, *সবুজ পত্র*-যুগে রবীন্দ্র ছোটগল্প বিচিত্রমাত্রিক শিল্প অন্বেষায় সমৃদ্ধ । বিশেষ করে *সবুজপত্র* যুগে চলিত গদ্যরীতির আন্দোলন, সেই সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর মনোভঙ্গির বিবিধ বিক্ষেপে রবীন্দ্র গল্পভুবন আলোড়িত হয়েছে। কাজী আবদুল ওদুদ যথার্থই মূল্যায়ন করেছেন :

> ১৩০৫ সাল থেকে ১৩১৮ সাল পর্যন্ত লেখা ছোট গল্পগুলোর একটি সাধারণ লক্ষণ যদি নির্দেশ করতে হয় তবে বলা যায় -সেটি হচ্ছে গল্পের পাত্র-পাত্রীদের মনোবিশ্লেষণের দিকে কবির কিছু বেশি ঝোঁক -সেই ঝোঁকে কিছু পরিমাণে আচ্ছন্ন হয়েছে এই কালের ছোটগল্পের পাত্র পাত্রীদের প্রাণধর্ম [কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৬৯ : ৩৯২]।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর রবীন্দ্র ছোটগল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

> এই গল্পগুলো সম্বন্ধে আরও একটি ব্যাপার লক্ষ্য করবার আছে; পরিবেশ যতই কঠোর হোক সেই পরিবেশের পাষাণ-দেয়ালে মাথা ঠুকে এদের পাত্রপাত্রীরা শুধু রক্তাক্তই হচ্ছে না, শেষ পর্যন্ত তারা সেই পরিবেশ আগ্রাহ্য করছে, অন্তত তার সামনে মাথা নত করছে না- তা সেজন্য যত মুল্যই তাদের দিতে হোক [কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৬৯ : ৩৯৩]।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, (দ্বিতীয় খণ্ড) দুটি উপশিরোনামে বিভক্তঃ " বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়" এবং পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে"। প্রথম অংশে সংযোজিত রচনার তালিকা হলো: *চিরকুমার সভা, নষ্টনীড়, চোখের বালি, বঙ্গদর্শন* ও ব্রহ্মবিদ্যালয়, *স্মরণ, শিশু* , *উৎসর্গ*, সংযোজন, *আত্মশক্তি, ভারতবর্ষ, চারিত্রপূজা, স্বদেশ, রাজাপ্রজা, সমূহ, খেয়া, শিক্ষা, বিচিত্র প্রবন্ধ, প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য,সাহিত্য, সাহিত্য সৃষ্টি, আধুনিক সাহিত্য, নৌকাডুবি, ধর্ম, প্রায়শ্চিত্ত, শারদোৎসব, গোরা, শান্তিনিকেতন (১), গীতাঞ্জলি, রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর,শান্তি নিকেতন (২), সঞ্চয়, পরিচয়, জীবনস্মৃতি, পথের সঞ্চয়, গীতিমালা* এবং নোবেল প্রাইজ লাভ। দ্বিতীয় অশে অন্তর্ভুক্ত রচনার পরিচিতি হলো: *গীতালি,* রবীন্দ্রকাব্যে *বলাকা, ফাল্গুনী, সবুজপত্রের* যুগের ছোটগল্প, *চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে,* জাপান যাত্রা, *'ন্যাশনালিজম'* ও *পার্সোন্যালিটি'*, কর্তার ইচ্ছায় কম, *পলাতকা,* "বিশ্বভারতী", স্যার উপাধি বর্জন, *লিপিকা, বাঁশি, শিশু ভোলানাথ*, গান, *মুক্তধারা, রক্তকরবী, পশ্চিমযাত্রীর ডায়রী, পূরবী, লেখন, নটীর পূজা, নটরাজ, জাভাযাত্রীর পত্র, যোগাযোগ, তপতী, শেষের কবিতা, মহুয়া, বনবাণী, সাহিত্যের পথে, রাশিয়ার চিঠি,* কবির আঁকা ছবি, পরিবেশ, পারস্যে, *মানুষের ধর্ম, পুনশ্চ, কালের যাত্রা, দুই বোন, মালঞ্চ, বাঁশরি: বিচিত্রিতা, চার অধ্যায়, শেষ সপ্তক, বীথিকা, পত্রপুট, শ্যামলী, খাপছাড়া ও ছড়ার ছবি, প্রান্তিক, সেঁজুতি, শাপমোচন, চণ্ডালিকা, বিশ্ব পরিচয়, কালান্তর, প্রহাসিনী, আকাশ প্রদীপ, নবজাতক, সানাই, শ্যামা,তিনসঙ্গী, রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে . সে- গল্প সল্প-ছেলেবেলা, সভ্যতার সংকট, শব্দতত্ত্ব-বাংলাভাষা পরিচয়- ছন্দ, ছড়া, শেষলেখা* ইত্যাদি।

রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনায় কাজী আবদুল ওদুদ কখনোই নিন্দুকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি। রবীন্দ্র সাহিত্য-বিচারের পরিবর্তে তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকর্মের পরিচয় তুলে ধরেছেন উত্তরকালের পাঠকের কছে। তারপরও ওদুদের দুচারটি মন্তব্য অবিস্মরণীয়। যেমন 'নষ্টনীড়' গল্পের পরিণতিকে তিনি 'গ্রীক ট্যাজেডির' [কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৬৯ : ৪]। সঙ্গে তুলনা করেছেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতন একটি সুবিশাল গ্রন্থ-প্রণয়নে কাজী আবদুল ওদুদ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন সে সম্পর্কে দুচার কথা বলা যায়। তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের কোনো রূপতাত্ত্বিক শ্রেণীবিন্যসে যাননি বরং তাঁর সাহিত্যকর্মকে বিবেচনা করেছেন প্রকাশ-কালানুযায়ী। এতে অবশ্যি রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি কালানুক্রমিক সুশৃঙ্খল পরিচয় উদঘাটিত হয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি এও সত্য যে এতে রূপতাত্ত্বিক একটি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোনো একটি শাখা যেমন, কবিতা, ছোটগল্প, কিংবা উপন্যাস সম্পর্কে গ্রন্থকারের কোনো সুনির্দিষ্ট সমালোচনারীতি বা দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর । অন্যদিকে একটি কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, কিংবা নাটক থেকে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস কিংবা নাটকে কবির প্রাগ্রসরতা, উত্তরণ বা ক্রমবিকাশ কিভাবে ঘটেছে তার কোনো পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে কাজী আবদুল ওদুদ রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার মন্থন করে রবীন্দ্রপ্রতিভার শিল্পসূক্ষ্ম স্তরকে উম্মোচনের পরিবর্তে তাঁর সৃজনশীলতার উপরিতলের বর্ণবৈভবের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।

কাজী আবদুল ওদুদ মাঝে-মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গ্যেটের তুলনা করেছেন, এবং এক্ষেত্রে সমালোচনার জন্যে তিনি তুলামূলক পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন। যেমন:

> আমাদের ধারণা, গ্যেটের বিখ্যাত উপন্যাস *Elective Affinities*-এর (স্বয়ংবৃত সম্পর্কাবলী) কিছু প্রভাব কবির এই 'চোখের বালি'র উপরে পড়েছে। স্বয়ংবৃত সম্পর্কাবলীর এডুয়ার্ড চরিত্রের সঙ্গে *চোখের বালির* মহেন্দ্র চরিত্রের যথেষ্ট মিল রয়েছে। ... উক্ত উপন্যাসের কাপ্তেনের সঙ্গে বিহারী চরিত্রের অনেকখানি মিল দেখতে পাওয়া যায় [কাজী আবদুল আবদুল ওদুদ ১৯৬৯ : ১১]।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক প্রসঙ্গকে টেনে আনেন নি। তিনি মূলত রবীন্দ্রীনথের সৃষ্টিশীল সত্তার বিশালতাকেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও রবীন্দ্র বিষয়ক কতিপয় প্রবন্ধ ওদুদের অন্যান্য গ্রন্থে সংযেজিত হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্য মূল্যায়নের পাশাপাশি তাঁর সঙ্গীতসাধনা, রাজনৈতিক সত্তা এবং সামাজিক চেতনার পরিচয়ও তিনি দিতে চেষ্টা করেছেন।'রবীন্দ্রনাথের গান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্র সঙ্গীতের কয়েকটি দিক সম্পর্কে তাঁর আলোচনা যাথেষ্ট কৌতূহল-উদ্দীপক এবং বিশ্লেষণধর্মী। বাংলা সাহিত্যে যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রতি, রাজনৈতিক অঙ্গনে তেমনি গান্ধীর প্রতি জনাব ওদুদের সশ্রদ্ধ বিশ্বাস ও সমর্থন ছিলো। ' গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে কাজী আবদুল

ওদুদ এই দুই মনীষীর রাজনৈতিক মতাদর্শের মিল-অমিলের এক লেখভাষ্য তৈরী করেছেন। উদঘাটন করেছেন কবিগুরুর রাজনৈতিক চারিত্র বৈশিষ্ট্য। গান্ধীর স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রগুলোতে রবীন্দ্রনাথ যে সর্বত্র সমর্থন দিতে অপারগ হয়েছেন, তার নিদর্শন তুলে ধরেছেন ওদুদ:

> গান্ধী সবাইকে চরকা কাটতে কাপড় বুনতে বলেছেন, তাতে রবীন্দ্রনাথ বলতে চান এই চরকার একঘেয়ে ঘর্ঘরে স্বরাজের আরতি হবে না, তার জন্যে দেশের সব শক্তির জাগরণ চাই। সেই শক্তির জাগরণ জ্ঞানের সম্প্রসারণে স্বরাজ-লাভের যোগ্যতা আমাদের ঘটবে [কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৬৯ : ৪৮]।

স্পষ্টত কাজী আবদুল ওদুদ রাজনৈতিক মতবাদে গান্ধীপন্থী হলেও ভারতবর্ষের সার্বিক স্বাধীনতার প্রশ্নে রবীন্দ্র-বক্তব্যকেই মূল্যবান মনে করেছেন।

পরিশেষে একটি কথা বলতে হয়, যে সময়ে বাঙালি মুসলমান সমাজে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য নানা দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিলো, কোনো কোনো ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছিলেন রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ; তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতি কাজী আবদুল ওদুদের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি, তাঁর আধুনিক মনন ও প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার পরিচয়বাহী। রবীন্দ্রনাথকে তিনি দেখেছেন সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে, বাঙালির রেনেসাঁসের আলোকে একারণেই রবীন্দ্র-প্রতিভা তাঁর কাছে এতো বড় ও মহৎ রূপে চিত্রিত হয়েছে।

বর্তমান শতাব্দীর প্রান্তে দাঁড়িয়ে কাজী আবদুল ওদুদের জীবনদৃষ্টিতে রবীন্দ্র-বিবেচনার স্বরূপ অন্বেষণ করতে গিয়ে আমরা তাঁর যে উদার শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই, তা সত্যিই সাহিত্যের ইতিহাসে মূল্যবান। মেধা ও মনীষায়, মন ও মননে কাজী আবদুল ওদুদ যে মুক্তবুদ্ধির চর্চা করতেন, তার পরিচয় তাঁর সাহিত্যকর্মেও প্রতিফলিত। বাঙালি মুসলমান সমাজের তিমির মগ্ন যুগে কাজী আবদুল ওদুদ যে অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন, সাহিত্য বিবেচনায় তিনি যে জীবনদৃষ্টি ও শিল্পদৃষ্টি অবলম্বন করেছেন-বর্তমান সময়েও অনেকাংশে তা প্রাসঙ্গিক।

টীকা

১. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। দু খন্ডে সমাপ্ত। প্রথম খন্ডের প্রকাশকাল ১৩৬৯ বাং (১৯৬২ খৃ:)। দ্বিতীয় খন্ডের প্রকাশকাল ১৩৭৬ বাং (১৯৬৯ ইং)।